সেসব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মেনেও নেওয়া যায়, তবে কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার মুকাবিলায় তার কোন মর্যাদা নেই। কেননা, কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম সবাই ক্ষমাযোগ্য।

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাস ঃ সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরে ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ওয়াজিব। তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা এবং যে কোন এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত না করা জরুরী। আকায়েদের সকল কিতাবে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে। ইমাম আহ্মদের এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে ঃ

لا يجوز لا حد ا ن يذ كر شيئا من مسا بهم و لا يطعن على احد منهم بعيب و لا نقص فمن فعل ذالك و جب تا د يبه -

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের কোন দোষ বর্ণনা করা অথবা তাঁদের কাউকে দোষী ও ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করা কারও জন্য বৈধ নয়। কেউ এরূপ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব।---(শরহুল আকিদাতিল ওয়াসেতিয়্যা, ৩৮৯ পৃঃ)

ইবনে তাইমিয়া 'ছারেমুল মসলুল' গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর বলেন ঃ

و هذا مما لا نعلم فيه خلا فا بين ا هل الفقه و ا لعلم من ا صحا ب رسو ل الله صلى الله عليه و سلم و التا بعين لهم با حسا ن و سا ئر ا هل السنة و الجما عة فا نهم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم و الاستغفار لهم و الترحم عليهم و التراضى عنهم و ا عتقا د محبتهم و موا لا تهم و عقوبة من ا ساء فيهم القول -

অর্থাৎ আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে আলিম, ফিকহ্বিদ, সাহাবী, তাবেয়ী ও আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সবাই একমত যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, তাঁদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টিবাক্য উচ্চারণ সহকারে তাঁদের উল্লেখ করা এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত ও সহৃদয়তার মনোভাব পোষণ করা সকলের জন্য ওয়াজিব। তাঁদের ব্যাপারে কেউ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

ইবনে তাইমিয়া "শরহে আকিদায়ে ওয়াসেতিয়্যা" গ্রন্থে সমগ্র উম্মত তথা আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে লিখেন ঃ

و يمسكو ن عما شجر بين الصحا بة و يقو لو ن هذه الا ثا ر المرو ية فى مسا ويهم منها ما هو كذ ب و منها ما زيد فيها و نقص و غير و جهه

والصحيح منه هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون - وهم مع ذالك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الاثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب فى الجملة ولهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم حتى انهم يغفرلهم من السيئات ما لا يغفرلمن بعدهم -

অর্থাৎ আহ্‌লে-সুন্নত ওয়াল জামা'আত সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ ব্যাপারাদিতে নিশ্চুপ থাকেন। তাঁরা বলেন ঃ যেসব রেওয়ায়েত থেকে তাঁদের মধ্যকার কারোও দোষ বোঝা যায়, সেগুলোর কতক সম্পূর্ণ মিথ্যা, কতক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত এবং যেগুলো সহীহ্ ও বিশুদ্ধ, সেগুলোর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ক্ষমার্হ। কেননা, তাঁরা যা কিছু করেছেন, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। এই ইজতিহাদে হয় তাঁরা অভ্রান্ত ছিলেন (তাহলে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী ছিলেন) না হয় ভ্রান্ত ছিলেন। (এমতাবস্থায়ও ক্ষমার্হ ও এক সওয়াবের অধিকারী ছিলেন)। এসব সত্ত্বেও আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন না যে, প্রত্যেক সাহাবী সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকে মুক্ত ; বরং তাঁদের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁদের গুণ-গরিমা ও ইসলামের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষামূলক কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যেতে পারে; এমনকি তাঁদের এমন সব গোনাহ্‌ও মাফ হতে পারে, যা উম্মতের পরবর্তী লোকদের মাফ হবে না।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ
وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِينَ
فِيهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ
لِلَّذِينَ اٰمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ۚ قِيلَ ارْجِعُوا
وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ؕ بَاطِنُهُ فِيهِ
الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ؕ
قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ
الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ

مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۭ هِيَ
مَوْلٰىكُمْ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ
قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ اِنَّ
الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ
الصِّدِّيْقُوْنَ ۚ وَالشُّهَدَاۗءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۭ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

(১২) সেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (১৩) সেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে ঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। (১৪) তারা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহ্‌র আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। (১৫) অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার

সময় আসেনি ? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (১৭) তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ই ভূভাগকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্য আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (১৮) নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহ্কে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (১৯) আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফির ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সেদিনও স্মরণীয়) যে দিন আপনি মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখভাগে ও ডান পার্শ্বে ছুটোছুটি করবে। (পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য এই জ্যোতি তাদের সাথে থাকবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, বাম পার্শ্বেও থাকবে। বিশেষভাবে ডান পার্শ্ব উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এদিককার জ্যোতি অধিক উজ্জ্বল হবে এবং এটা আলামত হবে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়ার। সম্মুখভাগে জ্যোতি থাকা এরূপ স্থলে সাধারণ রীতি। তাদেরকে বলা হবেঃ) আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য (বাহ্যত এই শেষোক্ত বাক্যটিও তখনই বলা হবে। এখন সংবাদ হিসাবে বলা হয়েছেঃ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ কথাটি সম্ভবত ফেরেশতাগণ বলবে, যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন। এটা সেদিন) যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুসলমানদেরকে (পুলসিরাতে) বলবেঃ তোমরা আমাদের জন্য (একটু) অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের জ্যোতি থেকে একটু আলো নেব। (এটা তখন হবে, যখন মুসলমান ঈমান ও আমলের কল্যাণে অনেক অগ্রে চলে যাবে এবং মুনাফিকরা পুলসিরাতের উপর পেছনে অন্ধকারে থেকে যাবে। তাদের কাছে পূর্ব থেকেই জ্যোতি থাকবে না, কিংবা দুররে-মনসূরের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের কাছেও কিছুটা জ্যোতি থাকবে, কিন্তু তা নির্বাপিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে বাহ্যিক কাজ-কর্মে তারা মুসলমানদের সাথে থাকত, এ কারণে তাদেরকে কিছুটা জ্যোতি দেওয়া হবে। কিন্তু অন্তরে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে আলাদা থাকত, এ কারণে তাদের জ্যোতি বিলীন হয়ে যাবে। এছাড়া তাদের প্রতারণার শাস্তিও তাই যে, প্রথমে জ্যোতি পাবে ও পরে

তা বিলীন হয়ে যাবে)। তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হবে ঃ (হয় ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবে, না হয় মু'মিনগণ) তোমরা পেছনে ফিরে যাও ও (সেখানে) আলোর সন্ধান কর। (পেছনে বলে সেই স্থান বোঝানো হয়েছে যেখানে ভীষণ অন্ধকারের পর পুলসিরাতে আরোহণ করার সময় জ্যোতি বণ্টন করা হয়েছিল। অর্থাৎ যেখানে জ্যোতি বণ্টন করা হয় সেখানে চলে যাও। সেমতে তারা সেখানে যাবে এবং কিছু না পেয়ে আবার এখানে আসবে)। অতঃপর (মুসলমানদের কাছে পৌঁছতে পারবে না বরং) উভয় দলের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে, যার একটি দরজা (ও) হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে আযাব। (দুররে মনসূরের বর্ণনা অনুযায়ী এটাই আ'রাফের প্রাচীর। অভ্যন্তর ভাগ মু'মিনদের দিকে এবং বহির্ভাগ কাফিরদের দিকে থাকবে। রহমতের অর্থ জান্নাত এবং আযাবের অর্থ জাহান্নাম। দরজাটি সম্ভবত কথাবার্তা বলার জন্য হবে অথবা এটাই হবে জান্নাতের পথ। মোটকথা, যখন তাদের ও মুসলমানদের মাঝখানে প্রাচীর স্থাপিত হবে এবং তারা অন্ধকারে থেকে যাবে, তখন) তারা মুসলমানদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? (অর্থাৎ কাজেকর্মে ও ইবাদতে তোমাদের সাথে শরীক ছিলাম। অতএব আজও সঙ্গে থাকা উচিত)। তারা (মুসলমানরা) বলবে ঃ হ্যাঁ (ছিলে) কিন্তু (এরূপ থাকা কোন্ কাজের? তোমরা কেবল দৃশ্যত আমাদের সাথে ছিলে। তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল এই যে) তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিলে (তোমরা পয়গম্বর ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে এবং তাদের উপর বিপদাপদ আসার) প্রতীক্ষা করেছিলে, (ইসলামের সত্যতায়) সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, অবশেষে তোমাদের উপর আল্লাহ্র আদেশ পৌঁছে গেছে। (মিথ্যা আশা এই যে, ইসলাম মিটে যাবে, আমাদের ধর্ম সত্য ও মুক্তিদাতা ইত্যাদি। 'আল্লাহ্র আদেশ' মানে মৃত্যু। অর্থাৎ সারাজীবন এসব কুফরীতেই লিপ্ত ছিলে, তওবাও করনি)। মহাপ্রতারক (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল। (একথা বলে যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। সারকথা এই যে, এসব কুফরীর কারণে তোমাদের বাহ্যত সঙ্গে থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়)। অতএব আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নয়। (প্রথমত মুক্তিপণ দেওয়ার মত বস্তু তোমাদের কাছে নেই, যদি থাকত তবুও গ্রহণ করা হত না। কেননা এটা প্রতিদান জগৎ---কর্মজগৎ নয়)। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের (চির) সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!

(فَالْيَوْمَ الخ কথাটি হয় মু'মিনদের না হয় আল্লাহ্ তা'আলার। এই পুরোপুরি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ঈমানে প্রয়োজনীয় ইবাদতের অভাব আছে, তা পূর্ণ নয়। তাই পরবর্তী আয়াতে ঈমান পূর্ণ করার জন্য শাসানোর ভঙ্গিতে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হচ্ছে ঃ) যারা মু'মিন, তাদের (মধ্যে যারা প্রয়োজনীয় ইবাদতে ত্রুটি করে; যেমন গোনাহ্গার মুসলমান তাদের) জন্য কি (এখনও) আল্লাহ্র উপদেশের এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার সামনে হৃদয়-বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? (অর্থাৎ তাদের

মনেপ্রাণে জরুরী ইবাদত পালনে এবং গোনাহ্ বর্জনে কৃতসংকল্প হওয়া উচিত)। তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে (ঐশী) কিতাব দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের মত। তারাও তাদের কিতাবের দাবীর বিপক্ষে খেয়াল-খুশী ও গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল)। অতঃপর তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয় (এবং তওবা করেনি)। ফলে তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে যায়। (ভুলক্রমেও তারা অনুতাপ করত না। অন্তরের এই কঠোরতার কারণে আজ) তাদের অধিকাংশই কাফির (কারণ, সদাসর্বদা গোনাহে লেগে থাকা, গোনাহ্কে ভাল মনে করা, সত্য নবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করা, এসব বিষয় প্রায়ই কুফরের কারণ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের শীঘ্রই তওবা করা উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে পরে তওবা করার তওফীক হয় না এবং মাঝে মাঝে তা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের অন্তরে গোনাহের কারণে কোন অনিষ্ট সৃষ্টি হয়ে থাকলে এই ধারণাবশত তওবা থেকে বিরত থেকো না যে, এখন তওবা করলে কি ফায়দা হবে? বরং তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলাই মাটিকে শুকিয়ে যাওয়ার পর সবুজ-সতেজ করেন। (এমনিভাবে তওবা করলে স্বীয় অনুগ্রহে মৃত অন্তরকে তিনি জীবিত করে দেন। অতএব নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা) আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (অতঃপর পূর্বোল্লিখিত ব্যয়ের ফযীলত বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী যারা আল্লাহ্কে আন্তরিকতা সহকারে ধার দেয়, তাদের দান তাদের জন্য (সওয়াবের দিক দিয়ে) বহুগুণে বাড়ানো হবে এবং (এরপরও) তাদের জন্য রয়েছে পছন্দনীয় পুরস্কার। (অতঃপর উল্লিখিত ঈমানের ফযীলত বলা হচ্ছে)ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ। (অর্থাৎ পূর্ণত্বের এসব স্তর পূর্ণ ঈমান দ্বারাই অর্জিত হয়। শহীদ তাকে বলা হয়, যে নিজের প্রাণকে আল্লাহ্র পথে পেশ করে দেয় যদিও নিহত না হয়। কারণ, নিহত হওয়া ইচ্ছা বহির্ভূত কাজ। তাদের জন্য জান্নাতে) রয়েছে তাদের (উপযুক্ত বিশেষ) পুরস্কার এবং (পুলসিরাতে রয়েছে বিশেষ) জ্যোতি। আর যারা কাফির ও আমার আয়াত অস্বীকারকারী, তারাই জাহান্নামী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি নাতিদীর্ঘ। এতে আছে যে, আবূ উমামা (রা) একদিন দামেশ্কে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে

মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া হল ঃ

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সব মু'মিন ও কাফিরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বন্টন করা হবে। প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দেওয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মু'মিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেওয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। ---(ইবনে কাসীর)

অতঃপর হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কোরআন পাক এই ঘটনা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছে ঃ

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ -

তিনি আরও বলেন, মু'মিনদেরকে যে নূর দেওয়া হবে, তা দুনিয়ার নূরের মত হবে না। দুনিয়ার নূর দ্বারা আশেপাশের লোকেরাও আলো লাভ করতে পারে। অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখের জ্যোতি দ্বারা দেখতে পারে না তেমনি মু'মিনের নূর দ্বারা কোন কাফির ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না।---(ইবনে কাসীর)

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা)-র এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, যে মনযিলে গভীর অন্ধকারের পর নূর বন্টন করা হবে, সেই মনযিল থেকেই কাফির মুনাফিকরা নূর থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কোন প্রকার নূর পাবেই না।

কিন্তু তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

পুলসিরাতের নিকটে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দান করবেন এবং প্রত্যেক মুনাফিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌঁছা মাত্রই মুনাফিকদের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে।---(ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকদেরকেও প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুল-সিরাতে পৌঁছার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যাই হোক, মুনাফিকরা তখন মু'মিনগণকে অনুরোধ করবে---একটু আস, আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা একটু উপকৃত হই। কারণ, দুনিয়াতেও নামায, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের অংশীদার ছিলাম। তাদের এই অনুরোধের নেতিবাচক জওয়াব দেওয়া হবে, যা পরে বর্ণিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টায়ই লেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে তদ্রূপ ব্যবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কোরআন পাক বলে : يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্কে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ধোঁকা দেন। ইমাম বগভী বলেন : এই ধোঁকার অর্থ তাই যে, প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে, এরপর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মু'মিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে। তাই তারা শেষ-পর্যন্ত নূর বহাল রাখার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এর উল্লেখ আছে :

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا -

মুসলিম, আহমদ ও দারে-কুতনীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র বর্ণিত হাদীসেও বলা হয়েছে : প্রথমে মু'মিন ও মুনাফিক---উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুলসিরাতে পৌঁছে মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফিরদের ন্যায় নূর পাবে না। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পরও এই উম্মতে মুনাফিক হবে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাদেরকে 'মুনাফিক' নাম দেওয়া যাবে না। অকাট্য ওহী ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উম্মতের কারও নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জানেন কার অন্তরে ঈমান আছে এবং কার অন্তরে নেই। অতএব আল্লাহ্র জ্ঞানে যারা মুনাফিক হবে, তাদেরকে প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

এই উম্মতে এ ধরনের মুনাফিক তারা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে।---(নাউযুবিল্লাহি মিনহু)

হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে ঃ তফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকারের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল ঃ

১. আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা)-র রেওয়ায়েতে এবং ইবনে মাজা বর্ণিত হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই বিষয়বস্তুরই রেওয়ায়েত হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ, যায়দ ইবনে হারেসা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবূ উমামা, আবূদ্দারদা, আবূ সাঈদ, আবূ মূসা, আবূ হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে।

২. মসনদে আহমদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من حافظ على الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামায যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই নামায তার জন্য নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নামায আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। সে কারূন, হামান ও ফিরাউনের সাথে থাকবে।

৩. তিবরানী বর্ণিত আবূ সায়ীদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য মক্কা মোকাররমা পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে---যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোরআনের একটি আয়াতও তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্য নূর হবে।---(মসনদে আহমদ)

৫. দায়লামী বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার প্রতি দরূদ পাঠ পুলসিরাতে নূরের কারণ হবে।

৬. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হজ্জের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ হজ্জ ও ওমরার ইহ্রাম খোলার জন্য যে মাথা মুণ্ডন করা হয়, তাতে মাটিতে পতিত কেশ কিয়ামতের দিন নূর হবে।---(তিবরানী)

৭. হযরত ইবনে মসউদ (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, মিনায় কংকর নিক্ষেপ কিয়ামতের দিন নূর হবে।---(মসনদে-বাযযার)

৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সেই চুল তার জন্য নূর হবে।---(তিরমিযী)

৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে একটি তীরও নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন সেই তীর তার জন্য নূর হবে।---(বাযযার)

১০. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহ্র যিকির করে, সে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন একটি নূর পাবে।----(বায়হাকী)

১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ ও কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য পুলসিরাতে নূরের দু'টি শাখা করে দেবেন, তদ্দ্বারা এক জাহান আলোকিত হয়ে যাবে।---(তিবরানী)

১২. বুখারী ও মুসলিম ইবনে ওমর (রা) থেকে, মুসলিম হযরত জাবের (রা) থেকে, হাকেম হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং তিবরানী ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, اياكم والظلم فانه هو الظلمات يوم القيامة অর্থাৎ তোমরা জুলুম ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাক। জুলুমই কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ লাভ করবে।

نعوذ بالله من الظلمات ونسأله النور التام يوم القيامة

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ

مِن نُّورِكُمْ—অর্থাৎ যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে ঃ আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা উপকৃত হই।

قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا— অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে ঃ যেখানে নূর বন্টন হয়েছিল, সেখানে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর। এ কথা মু'মিনগণ বলবে অথবা ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবে।

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ

الْعَذَابُ—অর্থাৎ মু'মিন অথবা ফেরেশতাগণের জওয়াব শুনে মুনাফিকরা সে স্থানে ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মু'মিনগণের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তাদের ও মু'মিনগণের মাঝখানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাগে মু'মিনদের জায়গায় থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে মুনাফিকদের জায়গায় থাকবে আযাব।

রূহুল-মা'আনীতে ইবনে যায়েদ (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, এটা হবে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যবর্তী আ'রাফের প্রাচীর। অপর কয়েকজনের মতে এটা ভিন্ন প্রাচীর হবে। এতে যে দরজা থাকবে, এটা হয় মু'মিন ও কাফিরদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলার জন্য, না হয় মু'মিনগণ এই দরজা দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নূরের ব্যাপারে কোরআনে কাফিরদের কোন উল্লেখই হয়নি। কারণ তাদের নূর পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। মুনাফিকদের নূর সম্পর্কে দ্বিবিধ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম থেকেই তারা নূর পাবে না কিংবা পাওয়ার পর পুলসিরাতে উঠতেই নিভিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের ও মু'মিনদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে। এই সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, শুধু মু'মিনগণই পুলসিরাত দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করবে। কাফির ও মুশরিকরা পুলসিরাতে উঠবে না। তাদেরকে জাহান্নামের প্রবেশপথ দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মু'মিনগণ পুলসিরাতের পথ অতিক্রম করবে। পাপী মু'মিনগণকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ কিছু দিন জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। তারা পুলসিরাত থেকে নিম্নে পতিত হয়ে জাহান্নামে পৌঁছবে। অন্যান্য মু'মিন নিরাপদে পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।---(শাহ্ আঃ কাদের দেহলভী)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

—অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

خشوع قلب—এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা।---(ইবনে কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া।---(রূহুল-মা'আনী)

এটা মু'মিনদের জন্য হুঁশিয়ারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন মু'মিনের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ

করে এই আয়াত নাযিল করেন।---(ইবনে কাসীর) ইমাম আ'মাশ বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।---(রূহুল-মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুঁশিয়ারি সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই হুঁশিয়ারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ-কর্মের জন্য তৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎ কর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেওয়া হবে।---(ইবনে কাসীর)

প্রত্যেক মু'মিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ্ ও আমর ইবনে মায়মূন (রা) বলেন, যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দীক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ مؤمنوا متى شهداء অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মু'মিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।---(ইবনে জরীর)

একদিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র কাছে কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ كلكم صديق وشهيد অর্থাৎ আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ আবূ হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ—

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মু'মিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মু'মিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই ঃ

أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ -

এই আয়াতে পয়গম্বরগণের সাথে মু'মিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা—সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্। বাহ্যত এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণ-গরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মু'মিনকেও কোন-না-কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রূহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামিল ও ইবাদতকারী মু'মিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুনা যেসব মু'মিন অনবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ اللعانون لا يكونون شهداء অর্থাৎ যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রা) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন ঃ তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইয্যতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না? জনতা আরয করল ঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইয্যতের উপর হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মুকাবিলায় সাক্ষ্য দেবে।— (রূহুল-মা'আনী)

তফসীরে মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيقُونَ বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে কিরামই সিদ্দীক, অন্য কোন মু'মিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম সকলেই পয়গম্বরসুলভ গুণ-গরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মু'মিন অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণ-গরিমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ

نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۙ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۙ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

(২০) তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীত বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ বৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এটা আল্লাহ্র কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহান কৃপার অধিকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

জেনে রাখ, (পরকালের মুকাবিলায়) পার্থিব জীবন (কিছুতেই কাম্য হবার যোগ্য নয়। কেননা, এটা নিছক) ক্রীড়া-কৌতুক, (বাহ্যিক) সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা (অর্থাৎ শক্তি, সৌন্দর্য ও কলাকৌশল নিয়ে) এবং ধনে ও জনে পারস্পরিক প্রাচুর্য লাভের প্রয়াস ব্যতীত কিছু নয়। (অর্থাৎ পার্থিব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই ঃ শৈশবে ক্রীড়া-কৌতুক, যৌবনে জাঁকজমক ও অহমিকা এবং বার্ধক্যে ধন ও জনের প্রবল বড়াই থাকে। এসব উদ্দেশ্য ধ্বংসশীল ও কল্পনা বিশ্বাস মাত্র। এর দৃষ্টান্ত এরূপ) যেমন বৃষ্টি (বর্ষিত হয়), যার বদৌলতে উৎপন্ন ফসল কৃষককে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুষ্ক হয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীত বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। (এমনিভাবে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, এরপর পতন ও অনুশোচনা মাত্র। পক্ষান্তরে) পরকালে আছে (দুটি বিষয়, একটি কাফিরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (অপরটি মু'মিনদের জন্য) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। (এই উভয় বিষয় চিরস্থায়ী। সুতরাং পরকাল চিরস্থায়ী এবং)

পার্থিব জীবন নিছক (ধ্বংসশীল, যেমন মনে করে) প্রতারণার সামগ্রী। (সুতরাং পার্থিব সম্পদ যখন ধ্বংসশীল এবং পরকালের ধন চিরস্থায়ী, তখন তোমাদের উচিত) তোমাদের পালনকর্তার দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান (অর্থাৎ এর চাইতে কম নয়, বেশী হতে পারে) এটা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটা অর্থাৎ ক্ষমা ও সন্তুষ্টি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (এতে ইঙ্গিত আছে যে, কেউ যেন নিজ আমলের কারণে গর্বিত না হয় এবং জান্নাত দাবী না করে বসে। জান্নাত নিছক আমার অনুগ্রহ, যা লাভ করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমি নিজ কৃপায় যারা এসব আমল করে, তাদের সাথে আমার ইচ্ছাকে জড়িত করেছি। ইচ্ছা না করাও আমার ক্ষমতাধীন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের জন্য পরকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাবে গ্রেফতার হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই ঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজসজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

لعب শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। لهو এমন খেলাধূলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময় ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لعب এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لهو শুরু হয়, এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলাধূলাকে জীবনের সম্পদ ও সর্বৃহৎ ধন মনে করে। কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে

তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধনসম্পদ, কুঠি, বাংলো ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পরে তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থ-হীন বস্তু। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনযিল। এ মনযিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁকজমক ও পদের জন্য গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর বরযখ ও কিয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কোরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে ঃ

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا

غَيْث— শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كُفَّار শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীর-বিদ كُفَّار শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফিররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কাফিররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসল-মানরাও হয়। জওয়াব এই যে, মু'মিনের আনন্দ ও কাফিরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মু'মিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহ্র কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মু'মিন কাফিরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফির আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফিররা খুবই আন-ন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য---পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ অর্থাৎ পরকালে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফিরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মু'মিনদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া নিয়ে মাতাল ও উদ্ধত হওয়ার পরিণামও কঠোর আযাব। কঠোর আযাবের বিপরীতে দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই হয় না; বরং আযাব থেকে বাঁচার পর মানুষ জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত দ্বারাও ভূষিত হয়। এটা রিযওয়ান তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ — অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ভরসা নেই; অতএব সৎ কাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোন রোগ অথবা ওযর তোমার সৎ কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎ কাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎ কাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রা) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেন ঃ তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন ঃ জিহাদে

সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ জামা'আতের নামাযে প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর।---(রূহুল-মা'আনী)

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্র করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ঐ পৃথিবীর আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী--عرض শব্দটি কোন সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতি বোঝা যায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ---পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নিয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সৎ কর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামতরাজির মূল্য হওয়া দূরের কথা। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বুখারী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না---আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। ---(মাযহারী)

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا
فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝۲۲
لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰي مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۭ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝۲۳ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ
وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ

الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

(২২) পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্য বলা হল, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ্‌ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না, কিন্তু তা (সবই) এক কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহফুযে) লিপিবদ্ধ থাকে প্রাণসমূহকে সৃষ্টি করার পূর্বেই (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিপদ পূর্ব-অবধারিত)। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ কাজ। (সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তিনি লিপিবদ্ধ করে দেন। কারণ, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। এটা এজন্য বলা হল) যাতে তোমরা যা হারাও (স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি অথবা ধনসম্পদ), তজ্জন্য (অতটুকু) দুঃখিত না হও, (যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণে ও পরকালের কাজে মশগুল হওয়ার পথে বাধা হয়ে যায়। নতুবা স্বাভাবিক দুঃখ করলে কোন ক্ষতি নেই) এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, (সে সম্পর্কেও আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ কৃপায় দিয়েছেন মনে করে) তজ্জন্য উল্লসিত না হও (কারণ, যার ব্যক্তি অধিকার আছে, সে-ই উল্লসিত হতে পারে। এখানে তো আল্লাহ্‌ নিজ ইচ্ছায় ও নির্দেশে দিয়েছেন। কাজেই উল্লসিত হওয়ার কোন অধিকার নেই)। আল্লাহ্‌ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না; (অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর কারণে অহংকার অর্থে اختيال শব্দ এবং বাহ্যিক ধনসম্পদ, পদ ইত্যাদির কারণের অহংকার অর্থে প্রায়ই فخر শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতঃপর কৃপণতার নিন্দা করা হচ্ছেঃ) যারা (দুনিয়ার মোহে) নিজেরাও (আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় খাতে ব্যয় করতে) কৃপণতা করে (যদিও খেয়াল-খুশী ও পাপ কাজে ব্যয় করতে মুক্তহস্ত থাকে) এবং (এই পাপও করে যে) অপরকে কৃপণতার আদেশ দেয়। (الَّذِيْنَ ---ব্যাকরণিক কায়দায় بدل . কিন্তু এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, শাস্তির আদেশ সবগুলো কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বরং প্রত্যেকটি মন্দ স্বভাবের জন্য শাস্তির আদেশ উচ্চারিত হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার মোহ এমন যে, এর সাথে অধিকাংশ মন্দ স্বভাবের সমাবেশ ঘটেই যায়---অহংকার, গর্ব, কৃপণতা ইত্যাদি) যে ব্যক্তি (সত্য ধর্ম থেকে, যার এক শাখা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করে না। কারণ, তিনি (সকলের ইবাদত ও ধন-সম্পদ থেকে) অভাবমুক্ত, (এবং স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে) প্রশংসার্হ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফিল করে দেয়। এক. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দুই. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِىْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ

قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا—অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহ্‌ফুযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا أٰتَاكُمْ—আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ্‌ তা'আলা লওহে মাহ্‌ফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালমন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তাভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে।---(রূহুল-মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধনসম্পদের কারণে উদ্ধত ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্‌ উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও

পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

(২৫) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নেবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (এই পরকাল সংশোধনের জন্য) আমার রসূলগণকে স্পষ্ট বিধানাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও (এতে বিশেষভাবে ন্যায়নীতি যা বান্দার হকের ব্যাপারে) ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (এতে স্বল্পতা ও বাহুল্য বর্জিত সমগ্র শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত আছে)। আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি (যাতে এর ভয়ে বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হয়ে যায়) এবং (এছাড়া) মানুষের বহুবিধ উপকার। (সেমতে অধিকাংশ যন্ত্রপাতি লৌহনির্মিত হয়ে থাকে। আরও এজন্য লৌহ সৃষ্টি করা হয়েছে) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেন কে (তাঁকে) না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) সাহায্য করে। (কেননা, লৌহ জিহাদেও কাজে আসে। এটা লোহার পারলৌকিক উপকার। জিহাদের নির্দেশ এজন্য নয় যে, তিনি এর মুখাপেক্ষী। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা (নিজে) শক্তিধর পরাক্রমশালী (বরং তোমাদের সওয়াবের জন্য এই নির্দেশ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঐশী কিতাব ও পয়গম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা ঃ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ -

بينات শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে ; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য মো'জেযা এবং রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে।---(ইবনে কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যত শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ بينات বলে মো'জেযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্য কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীযান' নাযিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্য নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও 'মীযান'-এর অর্থে শামিল আছে ; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদি পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বরগণ পর্যন্ত পৌঁছা সুবিদিত। কিন্তু মীযান নাযিল করার অর্থ কি ? এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কুরতুবী বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাক-পদ্ধতিতে এর নযীর বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ ঃ اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ وَوَضَعْنَا الْمِيْزَانَ অর্থাৎ আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা আর-রহমানের وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে ميزان শব্দের সাথে وضع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নূহ (আ)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাযিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল

করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না— পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহু পূর্বেই লওহে মাহ্‌ফুযে লিখিত ছিল---এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ —(রূহুল মা'আনী)।

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আল্লাহ্‌র বিধান ও ন্যায়-নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। দুই. এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। 'মীযান' ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীযানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃত-পক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে।চিন্তাধার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ—রূহুল মা'আনীতে আছে, এখানে واو অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ لِيَنْفَعَهُمْ—আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্য জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ
وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا
عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ
ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ
ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ
فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ
كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ
مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

(২৬) আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে

এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের পাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন, তোমাদেরকে দেবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহ্‌র সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া আল্লাহ্‌রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (মানুষের এই পরকাল সংশোধনের জন্যই) নূহ ও ইবরাহীম (আ)-কে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদের বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি (অর্থাৎ তাদের বংশধরগণের মধ্যেও কতককে পয়গম্বর এবং কতককে কিতাবধারী করেছি)। অতঃপর (যাদের কাছে পয়গম্বরগণ আগমন করেছেন) তাদের কতক সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [উপরোক্ত পয়গম্বরগণ স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিতাবধারীও ছিলেন; যেমন নূহ ও ইবরাহীম (আ) উভয়ের বংশধরের মধ্যে মূসা (আ) কেউ কেউ কিতাবধারী ছিলেন না, কিন্তু তাদের শরীয়ত স্বতন্ত্র ছিল; যেমন হূদ ও সালেহ (আ) মোটকথা, স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছি]। অতঃপর তাদের পশ্চাতে আরও রসূলগণকে (যারা স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী ছিলেন না) একের পর এক প্রেরণ করেছি [যেমন মূসা (আ)-র পর তওরাতের বিধানাবলী প্রয়োগ করার জন্য অনেক পয়গম্বর আগমন করেন] এবং তাদের অনুগামী করেছি (একজন স্বতন্ত্র শরীয়তধারী পয়গম্বরকে; অর্থাৎ) মরিয়ম-তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। (তার উম্মতে দুই প্রকার লোক ছিল —তার অনুগামী ও তাকে প্রত্যাখ্যানকারী)। যারা অনুসরণ করেছিল (অর্থাৎ প্রথম প্রকার আমি তাদের অন্তরে (পারস্পরিক) স্নেহ ও মমতা (যা প্রশংসনীয় গুণ) সৃষ্টি করে দিয়েছি (যেমন সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ কিন্তু তাদের শরীয়তে জিহাদ ছিল না বলে এর বিপরীতে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ উল্লেখ করা হয়নি। মোটকথা স্নেহ-মমতাই তাদের মধ্যে প্রবল ছিল। আমি তাদেরকে কেবল বিধানাবলী

পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু অনুসারীদের কেউ কেউ এমন ছিল যে) তারা নিজেরাই সন্ন্যাসবাদ উদ্ভাবন করেছে। [বিবাহ এবং বৈধ ভোগ-বিলাস ও মেলামেশা ত্যাগ করাই ছিল তাদের সন্ন্যাসবাদের সারমর্ম। এটা উদ্ভাবনের কারণ ছিল এই যে, ঈসা (আ)-র পর যখন খৃস্টানরা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে থাকে, তখন কিছুসংখ্যক সত্যপরায়ণ লোক নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করত। এটা প্রবৃত্তিপূজারীদের সহ্য করার কথা ছিল না। তাই তারা বাদশাহ্‌র কাছে অনুরোধ করল যে, এদেরকে আমাদের মতাবলম্বী হতে বাধ্য করা হোক। অতঃপর সত্যপরায়ণ লোকদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং সবার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নির্জন প্রকোষ্ঠে বসে অথবা ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।—(দুররে-মনসূর) এখানে তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সন্ন্যাসবাদ উদ্ভাবন করে]। আমি তাদের উপর এটা ফরয করিনি, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য (ধর্মের হিফাযতের জন্য) এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা (অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই)। তা (অর্থাৎ সন্ন্যাসবাদ) যথাযথভাবে পালন করেনি। [অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা এটা অবলম্বন করেছিল কিন্তু এই উদ্দেশ্যের প্রতি তেমন যত্নবান হয়নি এবং বিধানাবলী পালন করেনি—কেবল দৃশ্যত সন্ন্যাসবাদ প্রকাশ করেছে। এভাবে সন্ন্যাসীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। বিধানাবলী যথাযথ পালনকারী ও বিধানাবলীতে শৈথিল্যকারী। তাদের মধ্যে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমসাময়িক ছিল, তাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বিধানাবলী পালনের একটি শর্ত ছিল। তার বিধানাবলী পালন করেছে। আর যারা এই শর্ত পালন করেনি, তারা যথাযথভাবে বিধানাবলী পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি]। তাদের মধ্যে যারা [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি] বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের (প্রাপ্য) পুরস্কার দিয়েছি (কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম) এবং তাদের অধিকাংশ ছিল পাপাচারী। [তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। যেহেতু অধিকাংশই অবিশ্বাসী ছিল। তাই فَمَا رَعَوْهَا বাক্যে যথাযথ পালন না করার বিষয়টি সবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অল্পসংখ্যক যারা বিশ্বাসী ছিল, তাদের কথা আয়াতের শেষে فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খৃস্টানদের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুই শ্রেণীরই উল্লেখ করা হল। অতঃপর বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) হে [ঈসা (আ)-এ বিশ্বাসী] মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং (এই ভয়ের দাবী অনুযায়ী) তাঁর রসূল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি স্বীয় অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন (যেমন সূরা কাসাসে আছে, أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ এবং) তোমাদেরকে এমন জ্যোতি দেবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে। (অর্থাৎ এমন ঈমান দেবেন যা এখান থেকে পুলসিরাত পর্যন্ত সাথে থাকবে)। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা

করবেন। (কারণ, ইসলাম গ্রহণ করলে কাফির থাকাকালীন সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (এসব ধন তোমাদেরকে এজন্য দেবেন) যাতে (কিয়ামতের দিন) কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপর ও (রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত) তাদের কোন ক্ষমতা নেই; (এবং আরও জেনে নেয় যে) দয়া আল্লাহ্র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন (সেমতে তিনি মুসলমানদেরকে দান করেছেন)। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অহমিকা যেন চূর্ণ হয়ে যায়। তারা বর্তমান অবস্থাতেও নিজেদেরকে আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার পাত্র মনে করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হিদায়ত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মীযান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ)-র এবং পরে পয়গম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ নূহ (আ)-র সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا অর্থাৎ এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ)-র উল্লেখ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً —অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رحمت ও رأفت শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন ঃ رَأْفَة এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ কারও প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত

কারণ থাকে। এক. সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেওয়া। একে رافة বলা হয়। দুই. কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رحمت বলা হয়। মোটকথা رافة এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رحمت এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رافت-কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আ)-র সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رافت ও رحمت উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবায়ে কিরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাত্হ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ কিন্তু এর আগে সাহাবায়ে কিরামের আরও একটি বিশেষ গুণ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ও বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ তাঁরা কাফিরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, ঈসা (আ)-র শরীয়তে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফিরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোন স্থানই সেখানে ছিল না।

সন্ন্যাসবাদের অর্থ ও জরুরী ব্যাখ্যা ঃ وَرَهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوهَا—رهبانية শব্দটি رهبان এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। راهب ও رهبان-এর অর্থ যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আ)-র পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলিম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হল। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তাঁরা দেখলেন যে, মুকাবিলার শক্তি তাদের নেই; কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের ধর্মও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্য জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দেবেন, বিয়ে করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দেবেন, যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহ্র ভয়ে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন; তাই তাঁরা راهب অথবা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হত এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانيت তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করল।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হিফাযতের জন্য ছিল। তাই এটা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আল্লাহ্র জন্য নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেওয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণত মানত আসলে কারও উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে মানত করে নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ্ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং হাদিয়া ও নযর-নিয়ায আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে মানুষের ভীড় জমে উঠে। ফলে বেহায়াপনা ও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেওয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল---আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমত পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-র হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আ)-র পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মুকাবিলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মুকাবিলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মুকাবিলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্ন্যাসবাদ প্রথমে

তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরীয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্ন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল তা যথাযথ পালন করেনি—فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ابْتَدَعُوا শব্দটি بدعت থেকে উদ্ভূত হলেও এ স্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদ'আত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে كل بدعة ضلالة অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন ঃ

—وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেন ঃ আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্ন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্ন্যাসবাদও সত্তাগতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্ন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رهبانية শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رهبانية শব্দের আগে ابتدعوا বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি ; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্ন্যাসবাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও ابتداع শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কোরআন স্বয়ং এর বিরূপ সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদ'আতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদ'আতের অপরাধে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়—পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হত।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ ঃ বিশুদ্ধ কথা এই যে, رهبانية শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। এক. কোন অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি। কোরআন পাকের يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

দুই. অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোন পার্থিব কিংবা ধারায় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোন রোগব্যাধির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন---যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণত মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে; কিংবা কোন কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করে তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসবাদ নয়; বরং তাক্‌ওয়া যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

তিন. কোন্ অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে لا رهبانية فى الاسلام অর্থাৎ ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্ন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হিফাযতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ—এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদী ও খৃস্টানদের বেলায় 'আহ্‌লে-কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-র প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা الَّذِينَ آمَنُوا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খৃস্টানদের জন্য الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্ভবত এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সওয়াব হযরত মূসা (আ) অথবা ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরীয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় সওয়াব শেষ নবী (সা)-র প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফির ছিল এবং কাফির-দের কোন ইবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরীয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফির মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফির অবস্থায় কৃত সব সৎ কর্ম বহাল করে দেওয়া হয়। ফলে সে দুই সওয়াবের অধিকারী হয়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ এখানে لا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত বিধানাবলী এজন্য বর্ণনা করা হলো, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহ্‌র কৃপা লাভে সমর্থ হবে।

سورة المجادلة

সূরা মুজাদালা

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ ২২ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ
وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝١ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ
مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ
لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢ وَالَّذِيْنَ
يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ
قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٣
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ فَمَنْ
لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ
اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র

কাছে অভিযোগ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথা-বার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৩) যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা এই ঃ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (৪) যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৫) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৬) সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তু।

অবতরণের হেতু ঃ একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আউস ইবনে সামেত (রা) একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ انت علی کظهر امی অর্থাৎ তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়; মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি চিরতরে হারাম করার জন্য স্ত্রীকে বলা হত, যা চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রা) শরীয়তসম্মত বিধান জানার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ ما اراک الا قد حرمت علیه অর্থাৎ আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে। এক রেওয়ায়েতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে ঃ ما ذکر طلاقا অর্থাৎ আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতা-বস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেন ঃ اللهم انی اشکوا الیک অর্থাৎ আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) খাওলাকে একথা বললেন ঃ

ما أمرت في شانك بشئي حتى الان অর্থাৎ তোমার মাস'আলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব রেওয়ায়েতে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। ---(দুররে-মনসূর, ইবনে কাসীর) ফিকহ্‌র পরিভাষায় এই বিশেষ মাস'আলাটিকে 'জিহার' বলা হয়। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে জিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাওলা (রা)-র ফরিয়াদ শুনে তার জন্য তার সমস্যা সহজ করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে এসব আয়াত নাযিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল ঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীফা বললেন ঃ জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহ্‌র কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তাঁর সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।---(ইবনে কাসীর)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে নারী তার স্বামী সম্পর্কে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল (এবং বলছিল ঃ ما ذكر طلاقا অর্থাৎ সে তো তালাক উচ্চারণ করেনি। অতএব আমি কিরূপে হারাম হয়ে গেলাম?) এবং (নিজের দুঃখ ও কষ্টের জন্য) আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করছিল (এবং বলছিল ঃ اللهم انى اشكوا اليك) আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (অতএব তার কথা শুনবেন না কেন? 'আল্লাহ্ শুনেছেন' কথার উদ্দেশ্য এই নারীর দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং তার অক্ষমতা মেনে নেওয়া আল্লাহ্‌র জন্য শ্রবণ সপ্রমাণ করা নয়)। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে (এবং انت على كظهر امى বলে দেয়) সেই স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। (তাই এই কথা বলার কারণে এই মহিলারা তাদের মাতা হয়ে যায়নি যে, চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। চিরতরে হারাম হওয়ার অন্য কোন দলীলভিত্তিক কারণও নেই। অতএব তারা চিরতরে হারাম হবে না)। তারা (অর্থাৎ যারা স্ত্রীগণকে মাতা বলে দেয়) নিঃসন্দেহে অসঙ্গত ও মিথ্যা কথাই বলে। (তাই পাপ অবশ্যই হবে। এই পাপের ক্ষতিপূরণ করে দিলে তা মাফও হয়ে যাবে। কেননা) আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (অতঃপর এই ক্ষতিপূরণের কতক উপায় বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে (অর্থাৎ স্ত্রী হারাম হোক এটা চায় না) তাদের কাফ্ফারা এই ঃ (স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে) একে অপরকে

স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে। এটা (অর্থাৎ কাফ্ফারার বিধান) তোমাদের জন্য উপদেশ হবে; (কাফ্ফারা দ্বারা গোনাহ্ মার্জনা ছাড়া এই উপকারও হবে যে, ভবিষ্যতের জন্য তোমরা সতর্ক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের সব ক্রিয়াকর্মের খবর রাখেন। (অর্থাৎ কাফ্ফারা সম্পর্কিত আদেশ তোমরা পুরোপুরি পালন কর কিনা, তা তিনি জানেন। সুতরাং কাফ্ফারার রহস্য দুটি। এক. পাপ মার্জনা, যার প্রতি لَعَفُوٌّ غَفُورٌ এ ইঙ্গিত আছে, দুই. সতর্ককরণ, যা تُوعَظُونَ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। তিন প্রকার কাফ্ফারার মধ্যেই এই দ্বিতীয় রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু দাস মুক্ত করাকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণে একে এর সাথে বলে দেওয়া হয়েছে)। যার এ সামর্থ্য নেই (অর্থাৎ দাস মুক্ত করতে সক্ষম নয়) সে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে (স্বামী-স্ত্রী উভয়ে) পরস্পরে মেলামেশা করার পূর্বে। অতঃপর যে এতেও অক্ষম সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। (অতঃপর এই বিধান যে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ, এই বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূর্খতা যুগের প্রাচীন প্রথাকে উচ্ছেদ করা। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ) এটা এজন্য (বর্ণিত হয়েছে), যাতে (এই বিধান সম্পর্কিত উপযোগিতাসমূহ অর্জন করা ছাড়াও) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর (অর্থাৎ এই বিধানের ব্যাপারে তাঁদেরকে সত্যবাদী মনে কর। অতঃপর আরও তাকীদ করার জন্য ইরশাদ হচ্ছে ঃ) এগুলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধি)। কাফিরদের জন্য (যারা এসব বিধান মানে না) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (যারা আদেশ পালনে ত্রুটি করে, তাদের জন্যও সাধারণ শাস্তি হতে পারে। শুধু এই বিধানেরই বিশেষত্ব নেই; বরং) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে যে কোন বিধানে করুক, যেমন মক্কার কাফির সম্প্রদায়) তারা (দুনিয়াতেও) লাঞ্ছিত হবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা লাঞ্ছিত হয়েছে। (সেমতে একাধিক যুদ্ধে এটা হয়েছে। শাস্তি কেন হবে না? কারণ) আমি সুস্পষ্ট বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি। (অতএব এগুলো না মানা অবশ্যই শাস্তির কারণ। এ শাস্তি দুনিয়াতে হবে) আর কাফিরদের জন্য (পরকালেও) অপমানজনক শাস্তি আছে (এই শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে (প্রকৃতই কিংবা নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়ার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ সব বস্তু সম্পর্কে অবগত। (তাদের ক্রিয়াকর্ম হোক কিংবা অন্য কিছু)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ---পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লিখিত নারী হলেন হযরত আউস ইবনে সামেত (রা)-র স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে জিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূল করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে কেবল জিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেন নি ; বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য শুরুতেই বলে দিলেন ঃ যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেওয়া সত্ত্বেও মহিলা বারবার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই مجادلة বলা হয়েছে। কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে খাওলাকে বললেন ঃ তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধান নাযিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হল ঃ আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাযিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওহীও বন্ধ হয়ে গেল।---(কুরতুবী) এরপর খাওলা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের আওয়াজ শুনলেন ; খাওলা বিনতে সা'লাবা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন ঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ----(বুখারী, ইবনে কাসীর)

يظاهرون---اَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ শব্দটি ظهار থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে ظهار বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি এই ঃ স্বামী স্ত্রীকে বলে দেবে---انت على كظهر امى অর্থাৎ তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপকভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। ---(কুরতুবী)

জিহারের সংজ্ঞা ও বিধান ঃ শরীয়তের পরিভাষায় জিহারের সংজ্ঞা এই ঃ আপন স্ত্রীকে চিরতরে হারাম মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের এমন অঙ্গের সাথে তুলনা করা যা দেখা তার জন্য নাজায়েয। মাতার পৃষ্ঠদেশও এক দৃষ্টান্ত। মূর্খতা যুগে এই বাক্যটি চিরতরে হারাম বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হত এবং তালাক শব্দ অপেক্ষাও গুরুতর মনে করা হত। কারণ তালাকের পর প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহের মাধ্যমে আবার স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু জিহার করলে মূর্খতা যুগের প্রথা অনুযায়ী তাদের স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছে, প্রথমত স্বয়ং জিহারের প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলম্বন করা

দরকার। জিহারকে এ কাজের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, স্ত্রীকে মাতা বলে দেওয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই, যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে ঃ এরপর বলেছে ঃ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا অর্থাৎ তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে।

দ্বিতীয় সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোন মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেওয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا আয়াতের অর্থ তাই। এখানে لِمَا قَالُوا শব্দটি عَمَّا قَالُوا শব্দের অর্থে ব্যহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) يَعُودُونَ শব্দের অর্থ করেন يندمون---অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়।---(মাযহারী)

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ জিহার কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং জিহার করা এমন গোনাহ্, যার কাফ্ফারা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াতের শেষে إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি জিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা না-জায়েয। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ---অর্থাৎ জিহারের কাফ্ফারা এই যে, একজন দাস অথবা

দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশত অতগুলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে আহার করাবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে জন প্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দুসের গম।

জিহারের বিস্তারিত বিধান ও কাফ্ফারার মাস'আলা ফিকহ্‌র কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য।

হাদীসে আছে, খাওলা বিনতে সা'লাবার ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আলোচ্য আয়াতসমূহে জিহারের বিধান অবতীর্ণ হল তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তার স্বামীকে ডাকলেন। দেখা গেল যে, সে একজন ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধ লোক। তিনি তাকে আয়াত ও কাফ্ফারার বিধান শুনিয়ে বললেনঃ একজন দাস অথবা দাসী মুক্ত করে দাও। সে বললঃ একজন দাস ক্রয় করে মুক্ত করার মত আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। তিনি বললেনঃ তা হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখ। সে বললঃ সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করেছেন---আমার অবস্থা এই যে, আমি দিনে দুতিন বার আহার না করলে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। তিনি বললেনঃ তা হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে আরয করলঃ আপনি সাহায্য না করলে এরূপ করার সামর্থ্যও আমার নেই। অগত্যা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কিছু গম দিলেন এবং অন্যরাও কিছু গম চাঁদা তুলে এনে দিল। এভাবে ষাটজন মিসকীনকে ফিতরার পরিমাণে গম দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা হলো।---(ইবনে কাসীর)

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ---এই আয়াতে ঈমান বলে শরীয়ত ও বিধানাবলী পালন বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছেঃ কাফ্ফারা ইত্যাদির বিধান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তালাক, জিহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্খতা যুগের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুষম ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তথা কাফির, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ---পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌র সীমা ও ইসলামের বিধানাবলী পালন করার তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পার্থিব লাঞ্ছনা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ---এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে

পাপাচার করে যায় এবং তা তার স্মরণও থাকে না। স্মরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেওয়া। কিন্তু তার সব পাপাচার আল্লাহ্‌র কাছে লিখিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলার সব স্মরণ আছে। এজন্য আযাব হবে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۭ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى
ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ
وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ
يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۭ
وَاِذَا جَاۗءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ۭ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنٰجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ
اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَلَيْسَ بِضَاۗرِّهِمْ شَيْـــًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ
اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ
وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ
صَدَقَةً ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۭ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

رَّحِيْمٌ ۞ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞

(৭) আপনি কি ভেবে দেখেন নি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৮) আপনি কি ভেবে দেখেন নি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। তারা মনে মনে বলেঃ আমরা যা বলি, তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই জায়গা! (৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আল্লাহ্ভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহ্কে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (১০) এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। (১১) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। (১২) হে মু'মিনগণ! তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদ্কা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদ্কা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর।

শানে-নুযূলঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। এক. ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদীরা যখন কোন মুসলমানকে

দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দুই. মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে اِذَا تَنَا جَيْتُمْ فَلَا تَتَنَا جَوْا আয়াত নাযিল হয়। তিন. ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টুমির ছলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলত। سام শব্দের অর্থ মৃত্যু। চার. মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে কাসীর ইমাম আহমদ (র) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদীরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত ঃ

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ—অর্থাৎ আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? পাঁচ. একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) সুফ্ফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন ঃ আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্য জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

---(ইবনে কাসীর) রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে জায়গা খালি করে দেওয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপূত হয়নি। ছয়. কোন কোন বিত্তশালী লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ الخ

আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফতহুল-বয়ানে বর্ণিত আছে ঃ ইহুদী ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা نُهُوا عَنْهُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হল না, তখন إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ الخ আয়াত অবতীর্ণ হল। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থীরা কানাকানি করা থেকে বিরত হয়। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদ্‌কা প্রদান করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল।

সাত. যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ءَأَشْفَقْتُمْ الخ আয়াত নাযিল হল। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন ঃ সদ্‌কা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও فَإِن لَّمْ تَجِدُوا আয়াতে অসমর্থ লোকদের বেলায় আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিত্তশালীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবত তাদের জন্যই সদ্‌কা প্রদান করা কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদ্‌কা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা-বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা বলা ইবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই তারা কানকথা বলা বন্ধ করেছিল।---(সবগুলো রেওয়ায়েতই দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে)। অবতরণের এসব হেতু জানার ফলে আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা সহজ হবে।---(বয়ানুল-কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি এ বিষয়ে ভেবে দেখেন নি (নিষিদ্ধ কানাঘুষা থেকে যারা বিরত হত না, এখানে তাদেরকে শোনানোই উদ্দেশ্য) যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন। (তাদের কানাকানিও এই 'সবকিছু'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত)। তিন ব্যক্তির এমন কোন কানাকানি হয় না, যাতে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম (যেমন দুই অথবা চারজন) হোক বা বেশী (যেমন ছয় অথবা সাতজন) হোক, তিনি (সর্বাবস্থায়) তাদের সাথে থাকেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে বলে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (এই আয়াতের বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে পরবর্তী খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুর ভূমিকা। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যারা মিথ্যা কানাকানি করে তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে না। আল্লাহ্ সব খবর রাখেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেবেন। অতঃপর খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে ঃ) আপনি কি তাদের বিষয় ভেবে দেখেন নি এবং তাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা

হয়েছিল, অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাকানি করে। (অর্থাৎ তাদের কানাকানি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে গোনাহ্ এবং মুসলমানদেরকে দুঃখিত করার উদ্দেশ্য থাকার কারণে জুলুম এবং রসূলের নিষেধ করার কারণে রসূলের অবাধ্যতাও; যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে)। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে যদ্দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ভাষা তো এরূপ ঃ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى এবং صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا আর তারা বলে ঃ اَلسَّامُ عَلَيْكَ অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হোক) তারা মনে মনে (অথবা পরস্পরে) বলে ঃ (সে পয়গম্বর হলে) আমরা যা বলি (যাতে তার প্রতি পরিষ্কার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়) তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে (তাৎক্ষণিক) শাস্তি দেন না কেন? (তৃতীয় ও চতুর্থ ঘটনায় এর বর্ণনা আছে। অতঃপর তাদের এই দুষ্কর্মের জন্য শাস্তিবাণী এবং এই উক্তির জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি না হলে সর্বাবস্থায় শাস্তি না হওয়া জরুরী হয় না)। জাহান্নাম তাদের জন্য যথেষ্ট (শাস্তি)। তারা তাতে (অবশ্যই) প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা! (অতঃপর মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হচ্ছে। এতে মুনাফিকদের অনুরূপ কাজ করতে তাদেরকেও নিষেধ করা হয়েছে এবং মুনাফিকদেরকেও একথা বলা উদ্দেশ্য যে, তোমরা মুখে ঈমান দাবী কর, অতএব ঈমান অনুযায়ী কাজ করা তোমাদের উচিত। ইরশাদ হয়েছে ঃ) মু'মিনগণ, যখন তোমরা (কোন প্রয়োজনে) কানাকানি কর তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আল্লাহ্ভীতির বিষয়ে কানাকানি কর। (عدوان শব্দটি بر--এর বিপরীত। এর অর্থ অনুগ্রহ, যার উপকার অন্যে পায়। معصية الرسول ও اثم শব্দটি تقوى অর্থাৎ রসূলের অবাধ্যতার বিপরীত)। আল্লাহ্কে ভয় কর যার কাছে তোমরা সমবেত হবে এই কানাকানি তো কেবল শয়তানের (প্ররোচনামূলক) কাজ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য (যেমন প্রথম ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে)। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত যে তাদের (মুসলমানদের) কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (এটা মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি শয়তানের প্ররোচনায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করেও তবুও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। অতএব চিন্তা কিসের?) মু'মিনদের উচিত (প্রত্যেক কর্মে) আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা। (অতঃপর পঞ্চম ঘটনা অর্থাৎ মজলিসে কিছু লোক পরে আগমন করলে তাদের জন্য জায়গা খালি করে দেওয়ার আদেশ বর্ণিত হচ্ছে ঃ) মু'মিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয় ঃ [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন অথবা পদস্থ ও গণ্যমান্য লোকগণ বলেন] মজলিসে জায়গা করে দাও (যাতে পরে আগমনকারীও জায়গা পায়), তখন তোমরা জায়গা করে দিও; আল্লাহ্ তোমাদেরকে (জান্নাতে) প্রশস্ত জায়গা দেবেন।

যখন (কোন প্রয়োজনে) বলা হয়ঃ (মজলিস থেকে) উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো (তা আগমনকারীকে জায়গা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হোক কিংবা সভাপতির কোন বিশেষ পরামর্শ, আরাম কিংবা ইবাদত ইত্যাদির কারণে নির্জনতার প্রয়োজনে বলা হোক, যা নির্জনতা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না বা পূর্ণ হতে পারে না। মোটকথা, সভাপতির আদেশ হলে উঠে যাওয়া উচিত। রসূল নয়---এমন ব্যক্তির বেলায়ও এই নির্দেশ ব্যাপক। সুতরাং প্রয়োজনের সময় কাউকে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ জারি করার অধিকার সভাপতির আছে। তবে যে ব্যক্তি পরে মজলিসে আসে, তার এরূপ অধিকার নেই যে, কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসে যাবে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে তাই বর্ণিত আছে। মোট কথা, আয়াতে সভাপতির আদেশে উঠে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা (এই বিধান পালনের কারণে) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং (তাদের মধ্যে যারা ধর্মের) জ্ঞানপ্রাপ্ত, তাদের (পারলৌকিক) মর্যাদা (আরও অধিক) উচ্চ করে দেবেন। (অর্থাৎ এই বিধান পালনকারিগণ তিন প্রকার। এক. কাফির---যারা পার্থিব উপকারার্থে মেনে নেবে; যেমন মুনাফিকরাও তাই করবে। منكم শব্দের কারণে তারা এই ওয়াদার আওতা থেকে বের হয়ে গেছে। দুই. জ্ঞানপ্রাপ্ত নয়, এমন মু'মিনগণ। তাদের মর্যাদাই কেবল উচ্চ করা হবে। তিন. জ্ঞানপ্রাপ্ত মু'মিনগণ, তাদের মর্যাদা আরও অধিক উচ্চ করা হবে। কেননা, জ্ঞানের কারণে তাদের কর্ম অধিক ভীতিপূর্ণ ও অধিক আন্তরিক। এর ফলে কর্মের সওয়াব বেড়ে যায়)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কর্মের খবর রাখেন। (অর্থাৎ কার কর্ম ঈমানসহ এবং কার কর্ম ঈমান ব্যতীত; কার কর্মে আন্তরিকতা কম এবং কার কর্মে আন্তরিকতা বেশী, তা সবই তিনি জানেন। তাই প্রত্যেকের প্রতিদানে পার্থক্য রেখেছেন। অতঃপর প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনার সাথে সংযুক্ত ষষ্ঠ ঘটনা সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) মু'মিনগণ, তোমরা যখন রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাও, তখন কানকথা বলার পূর্বে কিছু সদ্কা (ফকীর-মিসকীনকে) প্রদান করবে। (এর পরিমাণ আয়াতে উল্লেখ নেই। হাদীসে বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত পরিমাণ অনির্দিষ্ট হলেও তা উল্লেখযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়)। এটা তোমাদের জন্য (সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে) শ্রেয়ঃ এবং (গোনাহ্ থেকে) পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। (কেননা, ইবাদত গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। বিত্তশালী মু'মিনদের বেলায় এই উপকারিতা। নিঃস্ব মু'মিনদের বেলায় উপযোগিতা এই যে, তারা আর্থিক উপকার লাভ করবে। 'সদ্কা' শব্দ থেকে তা জানা যায়। কেননা, সদ্কা নিঃস্বদের খাতেই ব্যয়িত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বেলায় উপযোগিতা এই যে, এতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি আছে এবং মুনাফিকদের কানাকানির ফলে তিনি যে কষ্ট অনুভব করতেন, তা থেকে মুক্তি আছে। কেননা, কানাকানির প্রয়োজন তাদের ছিল না; অতএব বিনা-প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল। সম্ভবত প্রকাশ্যে সদ্কা করার আদেশ ছিল, যাতে সদ্কা প্রদান না করে কেউ ধোঁকা দিতে সক্ষম না হয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, এই আদেশ সামর্থ্যবানদের জন্যঃ) অতঃপর যদি তোমরা সদ্কা প্রদান করতে সক্ষম না হও, (এবং কানাকানির প্রয়োজন থাকে) তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিনি তোমাদেরকে মাফ করবেন। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আদেশটি ওয়াজিব ছিল, কিন্তু অক্ষমতার অবস্থা ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল। অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনার সাথে সংযুক্ত সপ্তম ঘটনা

সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্‌কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? তোমরা যখন তা পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন, (আদেশটি সম্পূর্ণ রহিত করে মাফ করে দিলেন। কারণ, যে উপযোগিতার কারণে আদেশটি ওয়াজিব হয়েছিল, তা অর্জিত হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ যখন মাফ করে দিলেন) তখন তোমরা (অন্যান্য ইবাদত পালন কর; অর্থাৎ) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। (উদ্দেশ্য এই যে, এই আদেশ রহিত হওয়ার পর তোমাদের নৈকট্য লাভ ও মুক্তির জন্য অন্যান্য বিধান পালনে দৃঢ়তা প্রদর্শনই যথেষ্ট)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজকর্মের (এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার) পূর্ণ খবর রাখেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযূলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কোরআনী নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আকায়েদ, ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ গোপন পরামর্শ সাধারণত বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিনজনে পরামর্শ কর, তবে বুঝে নাও যে, চতুর্থ জন আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচজনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠজন আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বেজোড় সংখ্যা পছন্দনীয়। مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ আয়াতের সারমর্ম তাই।

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا

عَنِ النَّجْوٰى—শানে নুযূলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদী ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তুক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগন্তুক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারত না। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন। وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ বাক্যে এই নিষেধাজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমানদের জন্যও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি ও পরামর্শ করবে না, যদ্দ্বারা অন্য মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى يختلطوا بالناس فان ذالك يحزنه -

অর্থাৎ যেখানে তোমরা তিনজন একত্রিত হও, সেখানে দুইজন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুণ্ণ হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।---(মাযহারী)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى -

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেষ্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরীয়তবিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না থাকে; বরং সৎ কাজের জন্যই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

কাফিররা দুষ্টুমি করলেও নম্র ও ভদ্রসুলভ প্রতিরোধের নির্দেশ ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

ইহুদী ও মুনাফিকদের এই দুষ্টুমি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে السلام عليكم বলার পরিবর্তে السا م عليكم বলত। سام শব্দের অর্থ মৃত্যু। উচ্চারণে তেমন পার্থক্য না থাকায় মুসলমানদের দৃষ্টিতে তা সহজে ধরা পড়ত না। একদিন হযরত আয়েশা (রা)-র উপস্থিতিতে যখন তারা السا م عليكم বলল, তখন হযরত আয়েশা (রা) উত্তরে বললেন ঃ السا م عليكم ولعنكم الله و غضب عليكم

অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমরা অভিশপ্ত ও আল্লাহ্র গযবে পতিত হও। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে এরূপ জওয়াব দিতে নিষেধ করে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীল কথাবার্তা পছন্দ করেন না। তোমার উচিত কটুকথা পরিহার করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি শুনেন নি ওরা আপনাকে কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, শুনেছি এবং এর সমান প্রতিশোধও নিয়েছি। আমি উত্তরে বলেছি ঃ عليكم অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও। এটা জানা কথা যে, তাদের দোয়া কবুল হবে না এবং আমার দোয়া কবুল হবে। কাজেই তাদের দুষ্টুমির প্রত্যুত্তর হয়ে গেছে।---(মাযহারী)

মজলিসের কতিপয় শিষ্টাচার ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا

فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দেবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এই ঃ وَإِذَا قِيلَ

لَكُمُ انْشُزُوا فَانْشُزُوا---অর্থাৎ যখন তোমাদের কাউকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন উঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্য জায়গা করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

---لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه و لكن تفسحوا و توسعوا

অর্থাৎ একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তুকদের জন্য জায়গা করে দাও।---(বুখারী, মুসলিম, মসনদে আহমদ, ইবনে কাসীর)

এ থেকে বোঝা গেল যে, কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার জন্য বলা স্বয়ং আগন্তুকের জন্য জায়েয নয়। কাজেই একথা সভাপতি অথবা সভার ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বলতে পারে। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ যদি সভাপতি অথবা তাঁর নিযুক্ত ব্যবস্থাপক মণ্ডলী কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যেতে বলে, তবে উঠে যাওয়াই মজলিসের শিষ্টাচার। কারণ, মাঝে মাঝে স্বয়ং সভাপতি কোন প্রয়োজনে একান্তে থাকতে চায়; কিংবা বিশেষ লোকদের সাথে গোপন কথা বলতে চায়; কিংবা পরে আগমনকারীদের জন্য একমাত্র ব্যবস্থা এরূপ থাকতে পারে যে, কিছু জানাশোনা লোককে উঠিয়ে দিয়ে আগন্তুকদেরকে সুযোগ দেওয়া। যাদেরকে উঠানো হবে, তারা হয়ত অন্য সময়ও মজলিসে বসে উপকৃত হতে পারবে।

তবে সভাপতি ও ব্যবস্থাপকদের অবশ্য কর্তব্য হবে এমনভাবে উঠে যেতে বলা, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লজ্জিত না হয় এবং তার মনে কষ্ট না লাগে।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) সুফ্ফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদ জনাকীর্ণ ছিল। পরে কয়েকজন প্রধান সাহাবী সেখানে আগমন করেন। তাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিধায় অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু জায়গা না থাকার কারণে বসার সুযোগ পেলেন না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে সবাইকে চেপে বসে জায়গা করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কোন কোন সাহাবীকে উঠে যেতেও বললেন। যাদেরকে উঠালেন, তারা হয়তো এমন লোক ছিলেন, যারা সর্বক্ষণ মজলিসে হাযির থাকতে পারেন। কাজেই তাদের উঠে যাওয়া তেমন ক্ষতিকর ছিল না। অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন চেপে বসতে আদেশ করলেন, তখন কেউ কেউ এই আদেশ পালন করেনি। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে মজলিসের কয়েকটি শিষ্টাচার জানা গেল। এক. মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত পরে আগমনকারীদের জন্য জায়গা করে দেওয়া। দুই. যারা পরে আগমন করে, তারা কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। তিন. প্রয়োজন মনে করলে সভাপতি কিছু লোককে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন। আরও কতিপয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরে আগমনকারীরা প্রথম থেকে উপবিষ্ট লোকদের ভেতরে অনুপ্রবেশ না করে শেষ প্রান্তে বসে যাবে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে তিনজন আগন্তুকের বর্ণনা আছে। তাদের মধ্যে একজন মজলিসে জায়গা না পেয়ে এক প্রান্তে বসে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রশংসা করেন।

মাস'আলা ঃ মজলিসের অন্যতম শিষ্টাচার **এই** যে, দুই উপবিষ্ট ব্যক্তির মাঝখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসা যাবে না। কেননা, তাদের একত্রে বসার মধ্যে কোন বিশেষ উপযোগিতা থাকতে পারে। আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا يحل لرجل أن يفرق

بين اثنين الا باذنهما অর্থাৎ একত্রে উপবিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবধান সৃষ্টি করা তৃতীয় কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়।—(ইবনে কাসীর)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ — রসূলুল্লাহ্ (সা) জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয় বাণী শুনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টুমিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই বোঝা হালকা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কোরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আলী (রা) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হযরত আলী (রা) ই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পান নি ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেওয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী (রা) প্রায়ই বলতেন ঃ কোরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি—আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত।—(ইবনে কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক ; কিন্তু এর ঈপ্সিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আন্তরিক মহব্বতের তাকীদেই এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফিকী ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا
مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا

شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَّن تُغْنِيَ
عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا
يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ
فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾
لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

(১৪) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যারা আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। (১৬) তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে, অতএব তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭) আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে

নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। (২১) আল্লাহ্‌ লিখে দিয়েছেন---আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২২) যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি (অর্থাৎ মুনাফিকদের প্রতি) যারা আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত (অর্থাৎ ইহুদী ও কাফির) সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? (মুনাফিকরা ইহুদী ছিল, তাই তাদের বন্ধুত্ব ইহুদীদের সাথে এবং কাফিরদের সাথেও সুবিদিত ছিল)। তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা পুরোপুরি) মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং (পুরোপুরি) তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদেরও) দলভুক্ত নয়। (বরং তারা বাহ্যত তোমাদের সাথে আছে এবং বিশ্বাসগতভাবে কাফিরদের সাথে আছে)। তারা মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (অর্থাৎ শপথ করে বলে যে, তারা মুসলমান; যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ) এবং নিজেরাও জানে (যে, তারা মিথ্যাবাদী। অতঃপর তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছেঃ) আল্লাহ্‌ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (কারণ) নিশ্চিতই তারা যা করে, খুবই মন্দ। (কুফর ও নিফাক থেকে মন্দ কাজ আর কি হবে? এসব মন্দ কাজের মধ্যে একটি মন্দ কাজ এই যে) তারা তাদের (এসব মিথ্যা) শপথকে (আত্মরক্ষার জন্য) ঢাল করে রেখেছে, (যাতে মুসলমান তাদেরকে মুসলমান মনে করে এবং জান ও মালের ক্ষতি না করে) অতঃপর তারা (অন্যদেরকেও) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ ধর্ম) থেকে নিবৃত্ত রাখে (অর্থাৎ বিভ্রান্ত করে); অতএব (এ কারণে) তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (অর্থাৎ শাস্তি যেমন কঠোর হবে; তেমনি অপমানজনকও হবে। যখন এই শাস্তি শুরু হবে, তখন) আল্লাহ্‌র কবল (অর্থাৎ আযাব) থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। (এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সেই কঠোর ও অপমানজনক শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম)। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (এই শাস্তি সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সকলকে (অন্যান্য সৃষ্ট জীবসহ) পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সামনেও

(মিথ্যা) শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে (মুশরিকদের মিথ্যা শপথ কোরআনের এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ) এবং তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। (কাজেই মিথ্যা শপথের বদৌলতে বেঁচে থাকে)। সাবধান, ওরাই তো মিথ্যাবাদী। (কারণ, ওরা আল্লাহ্‌র সামনেও মিথ্যা বলতে দ্বিধা করেনি। ওদের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের কারণ এই যে) শয়তান তাদেরকে পুরোপুরি বশীভূত করে নিয়েছে (ফলে তারা এখন শয়তানের কথামতই কাজ করছে) অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। (অর্থাৎ তারা তাঁর বিধি-বিধান ত্যাগ করে বসেছে। বাস্তবিকই) তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দল অবশ্যই বরবাদ হবে; (পরকালে তো অবশ্যই, মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও। তাদের এই অবস্থা কেন হবে না, তারা তো আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী। নীতি এই যে) যারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই (আল্লাহ্‌র কাছে) লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। (আল্লাহ্‌র কাছে যখন তারা লাঞ্ছিত, তখন উপরোক্ত পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের জন্য যেমন লাঞ্ছনা অবধারিত করে রেখেছেন, তেমনি অনুগতদের জন্য সম্মান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কেননা, তারা আল্লাহ্‌ ও রসূলগণের অনুসারী)। আল্লাহ্‌ তা'আলা (আদি নির্দেশনামায়) লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রসূলগণ বিজয়ী হব। (এটাই সম্মানের স্বরূপ। এখানে রসূলগণের বিজয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য; কিন্তু রসূলগণের সম্মানার্থে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেকেও জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং রসূলগণ যখন সম্মানিত, তখন তাঁদের অনুসারিগণও সম্মানিত। বিজয়ী হওয়ার অর্থ সূরা মায়েদা ও সূরা মু'মিনে বর্ণিত হয়েছে)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (তাই তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন। অতঃপর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে মুনাফিকদের বিপরীতে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যারা আল্লাহ্‌ ও কিয়ামত দিবসে (পুরোপুরি) বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের (অন্তরকে) শক্তিশালী করেছেন স্বীয় ফয়য দ্বারা ('ফয়য' বলে নূর বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ হিদায়ত অনুযায়ী বাহ্যিক কর্ম এবং অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি। فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ আয়াতে এই নূরই উল্লিখিত হয়েছে। এই নূর অর্থগত জীবনের কারণ। তাই একে রূহ্‌ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মু'মিনগণ এই সম্পদ দুনিয়াতে লাভ করবে এবং পরকালে) তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে; (যেমন অন্য আয়াতে أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ এরপর أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ বলা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ —এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্র শত্রু কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদী, খৃস্টান অথবা অন্য যে-কোন প্রকার কাফিরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভব-পরও নয়। কেননা, মু'মিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র মহব্বত। কাফির আল্লাহ্র দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফিরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফিরদের সাথেও করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্য ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্য মুসলমানদের জন্যও ক্ষতিকর না হয়।

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ —কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন ঃ এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ ; দেহাবয়ব বেঁটে, গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হাল্কা শ্মশ্রুমণ্ডিত। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন ? সে শপথ করে বলল ঃ আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।—(কুরতুবী)

মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফিরের সাথে হতে পারে না ঃ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ الاية প্রথম আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহ্র গযব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের

অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র শত্রু অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফির তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবারই এই অবস্থা ছিল। এ স্থলে তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সম্পর্কছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

একবার সাহাবী আবদুল্লাহ (রা)-র সামনে তাঁর মুনাফিক পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করল। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন না। একবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর সামনে তাঁর পিতা আবূ কোহাফা রসূলে করীম (সা) সম্পর্কে কিছু ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করলে দয়ার প্রতীক হযরত আবূ বকর (রা) ক্রোধান্ধ হয়ে পিতাকে সজোরে চপেটাঘাত করেন। ফলে আবূ কোহাফা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ভবিষ্যতে এরূপ করো না। হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র পিতা জাররাহ্ ওহুদ যুদ্ধে কাফিরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সে বারবার হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র সামনে আসত কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন। এরপরও যখন সে নিবৃত্ত হল না এবং পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখল, তখন হযরত আবূ ওবায়দা (রা) বাধ্য হয়ে পিতাকে হত্যা করলেন। সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।---(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ পাপাসক্ত ফাসিক-ফাজির ও কার্যত ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফিকহ্‌বিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিস্‌ক তথা পাপাসক্তির বীজাণু বিদ্যমান আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসিক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে। তাই রসূলে করীম (সা) তাঁর দোয়ায় বলতেন ঃ اللهم لا تجعل لفا جر على يدا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে কোন পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে ঋণী করো না। অর্থাৎ তার কোন অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা, সম্ভ্রান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসিকদের অনুগ্রহ কবুল করা তাদের প্রতি মহব্বতের সেতু। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই সেতু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।---(কুরতুবী)

وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ — এখানে কেউ কেউ রূহ্-এর তফসীর করেছেন নূর, যা মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ্-এর তফসীর করেছেন কোরআন ও কোরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই মু'মিনের আসল শক্তি।---(কুরতুবী)

سورة الحشر

সূরা হাশর

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৪ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ

الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ

فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۤ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۤ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝٢

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاۗءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۭ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

عَذَابُ النَّارِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۗقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاۗقِّ اللّٰهَ

فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَاۗىِٕمَةً

عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন।

তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। (৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্রই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

যোগসূত্র ও শানে-নুযূলঃ পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধুত্বের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের বৃত্তান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনূ নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলমান-ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনূ নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল ঃ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দেবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু রাখে আল্লাহ্ মারে কে? রসূলুল্লাহ্ (সা) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠালেন ঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লংঘন করেছ। অতএব তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। বনূ নুযায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল ঃ তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দেবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেবে না। রূহুল মা'আনীতে আছে এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে মালিক, মুয়ায়দ এবং রায়েস ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর সাথে শরীক ছিল। বনূ নুযায়ের তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সদর্পে বলে পাঠাল ঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে বনূ নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনূ নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে

রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল! রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেমতে বনূ নুযায়েরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খায়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খায়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্বয়ই 'প্রথম সমাবেশ ও দ্বিতীয় সমাবেশ' নামে অভিহিত।---(যাদুল মা'আদ)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (তাঁর মহত্ত্ব, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার এক প্রভাব এই যে, তিনিই কাফির কিতাবধারীদেরকে অর্থাৎ বনূ নুযায়েরকে) তাদের বসতবাড়ী থেকে প্রথমবার একত্র করে বহিষ্কার করেছেন। [যুহরী বলেনঃ তারা প্রথমবার এই বিপদে পতিত হয়েছিল, যা ছিল তাদের দুষ্কর্মের ফলশ্রুতি। এতে পুনরায় তাদের এই বিপদে পতিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। সেমতে হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে পুনরায় তাদেরকে আরবভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের বাস্তুভিটা থেকে বহিষ্কার করা মুসলমানদের শক্তি ও প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল। মুসলমানগণ, তাদের সাজসরঞ্জাম ও জাঁকজমক দেখে] তোমরা ধারণা করতে পারনি যে, তারা (কখনও তাদের বাস্তুভিটা থেকে) বের হবে এবং (খোদ) তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ তারা তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের কারণে নিশ্চিত ছিল। তাদের মনে কোন সময় অদৃশ্য প্রতিশোধের আশংকাও জাগত না। অতঃপর আল্লাহ্র শাস্তি তাদের উপর এমন জায়গা থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের হাতে বহিষ্কৃত হল, যাদের নিরস্ত্রতার প্রতি লক্ষ্য করলে এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না, এই নিরস্ত্র লোকেরা সশস্ত্রদের বিপক্ষে বিজয়ী হবে।) তাদের অন্তরে (আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের) ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। (এই ত্রাসের কারণে তারা বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তখন তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) তারা তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। (অর্থাৎ কড়িকাঠ, তক্তা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেরাও গৃহ ধ্বংস করছিল এবং মুসলমানরাও তাদের অন্তর ব্যথিত করার জন্য ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করছিল।) অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, (এ অবস্থা দেখে) শিক্ষা গ্রহণ কর। (আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও শোচনীয় হয়ে থাকে)। আল্লাহ্ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে তাদেরকে দুনিয়াতেই (হত্যার) শাস্তি দিতেন (যেমন তাদের পরে বনী কোরায়যার

ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। দুনিয়াতে যদিও তারা শাস্তির কবল থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা (তাদের এই বিরুদ্ধাচরণ দ্বিবিধ প্রকারে হয়েছে। এক. চুক্তি ভঙ্গ করা, যে কারণে নির্বাসনদণ্ড হয়েছে এবং দুই. আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। এটা পরকালীন আযাবের কারণ। ইহুদীরা বলেছিল ঃ বৃক্ষ কর্তন করা ও বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করা অসমর্থের শামিল। অনর্থ নিন্দনীয়। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক মুসলমান মনে করেছিল যে, এসব বৃক্ষ ভবিষ্যতে মুসলমানদেরই হয়ে যাবে। কাজেই এগুলো কর্তন না করাই উত্তম। সেমতে তারা কর্তন করেনি। আবার কেউ কেউ ইহুদীদের অন্তর ব্যথিত করার উদ্দেশ্যে কর্তন করেছে। অতঃপর এসব বিষয়ের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। জওয়াবের সাথে উভয় কাজকে সঠিক বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা যে কতক খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ (এমনিভাবে যে কিছু পুড়িয়ে দিয়েছে) এবং কতক না কেটে কাণ্ডের উপর দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছ, তা তো (অর্থাৎ উভয় কাজই) আল্লাহ্র আদেশ (-ও সন্তুষ্টি) অনুযায়ীই, তাতে তিনি কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (অর্থাৎ উভয় কাজের মধ্যে উপযোগিতা আছে। ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেও মুসলমানদের এক সাফল্য এবং কাফিরদেরকে বিক্ষুব্ধ করার ফায়দা আছে। কারণ, এগুলো মুসলমানরা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে কর্তন করা ও পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে মুসলমানদের অপর সাফল্য অর্থাৎ তাদের প্রাধান্য প্রকাশ পাওয়া এবং কাফিরদেরকে বিক্ষুব্ধ করার ফায়দা আছে। অতএব উভয় কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হওয়ার কারণে এগুলোতে কোন দোষ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনূ নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস ঃ সমগ্র সূরা হাশর ইহুদী বনূ নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।---(ইবনে ইসহাক) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই সূরার নামই সূরা বনূ নুযায়ের বলতেন।---(ইবনে কাসীর) বনূ নুযায়ের হযরত হারূন (আ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সংবাদ, হুলিয়া ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লিখিত আছে। এই পরিবার শেষ নবী (সা)-র সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষ নবী (সা)। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী হযরত হারূন (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন বনী ইসরাইলের পরিবর্তে বনী ইসমাঈলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষ নবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল,

কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চেনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বল ভিত্তি। ফলে ওহুদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টল্‌টলায়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তি চুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরত ইবনে হিশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনূ নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনূ নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগবাগিচা ছিল।

ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যত এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনূ নুযায়েরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কোরায়শী কাফিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশজন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবূ সুফিয়ান চল্লিশজন কোরায়শী নেতাসহ কা'বা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহ্‌র গিলাফ স্পর্শ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং সাহাবী মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনূ নুযায়েরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযূলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে গৃহের নীচে তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বসিয়েছিল তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে জাহ্‌হাশ। আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একটি শিক্ষা ঃ আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী পর্যায়ে বনূ নুযায়েরের সবাই নির্বাসিত হয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনাতেই

নিরাপদ জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের একজন ছিল এই ওমর ইবনে জাহ্হাশ, দ্বিতীয় জন তার পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব।---(ইবনে কাসীর)

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা ঃ শানে-নুযূলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ ব্যাপারেই বনূ নুযায়েরের চাঁদা আদায়ের জন্য তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর লিখেন ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী নাতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছুসংখ্যক মুনাফিক ও কাফির তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তরজন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফিররা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমরী (রা) কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এই মাত্র কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফিরদের মুকাবিলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুইজন কাফিরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যা করে দেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শান্তি চুক্তি ছিল।

আজকালকার রাজনৈতিক চুক্তিসমূহে প্রথমেই চুক্তিভঙ্গের পথ খুঁজে নেওয়া হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর চুক্তি এরূপ ছিল না। এখানে যা কিছু মুখ অথবা কলম দিয়ে বের হয়ে যেত, তা ধর্মীয় ও আল্লাহ্র নির্দেশের মর্যাদা রাখত এবং তা যথাযথ পালন করা অপরিহার্য হয়ে যেত। আমরের এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের আইনানুযায়ী নিহত ব্যক্তিদের রক্ত বিনিময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং চাঁদার ব্যাপারে তাঁকে বনূ নুযায়ের গোত্রেও গমন করতে হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার ঃ আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণকল্পে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, এর জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিশ্বে মানবাধিকারের হর্তাকর্তা কথিত হন। প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত ঘটনার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। বনূ নুযায়েরের উপর্যুপরি চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, রসূল হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রসূলে করীম (সা)-এর গোচরে আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকালকার কোন মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানের গোচরীভূত হত তবে ইনসাফের সাথে বলুন তারা এহেন লোকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত লোকদের উপর পেট্রোল ঢেলে ময়দান পরিষ্কার করে দেওয়া কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। কিছু গুণ্ডা, দুষ্কৃতকারী